আল্লাহর শরীয়াহ পরিবর্তনকারী শাসকদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান – শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনি

আল্লাহর শরীয়াহ পরিবর্তনকারী শাসকদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান – শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনি

আল্লাহ তাআলার শরিয়ত পরিবর্তনকারী শাসকদের শরয়ী' হুকুম জানা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। এই বিষয়টাকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করে এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ নাই।

কারণ, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও মারত্মক পর্যায়ের সমস্যা এই বিধানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সেগুলোর অন্যতম হল, এই জাতীয় শাসকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের আনুগত্যে পা না দেয়া, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়া।

এই প্রত্যেকটি মাসআলাই এমন যে, এর উপর পূর্ববর্তী সকল আহলে ইলম একমত পোষণ করেছেন।

কেউ কেউ মনে করেন,

“এই সমস্ত বিষয় মুসলমানদের দাওয়াত ইলাল্লাহ কিংবা ইলম অন্বেষণের পথে বাধার সৃষ্টি করে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে”...

তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক এবং ভিত্তিহীন। এই দাবির সাথে শরিয়তের বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই।

কারণ, আমাদের পূর্বসূরি আহলে ইলমগণ এ ফায়সালা দিয়ে গেছেন যে,

মুলহিদদের কাফির বলা জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। বিশেষতঃ তারা যখন ক্ষমতা ও যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তদানের কেন্দ্রভুমিতে পরিণত হয়।

মুসলমানদের অবশ্যই জানা উচিত যে, এই সমস্ত শাসকদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করার ফলেই মুসলিম উম্মাহর উপর যত সব বিপদ-আপদ ও বালা মসিবত চেপে বসেছে। এর ফলেই উম্মাহর বিরাট একটা অংশ আজ না জেনে, না বুঝে এই সব তাগুত শাসকদের সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়েই তারা অন্য কোন ক্ষেত্রে না হোক, অন্তত মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাসআলায় কাফের ও মুরতাদ বাহিনীর সদস্যে পরিণত হয়েছে।

এই নিরবতার কারণেই উম্মতে মোহাম্মদীর মাঝে তাদের ভ্রান্ত নীতি ও ভ্রষ্ট কর্মপদ্ধতির আলোকে কাজ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে। তাদের প্রণীত এই সব নিয়ম-কানুনের আলোকে আজ হারাম মালকে হালাল মনে করা হয়েছে। অবৈধপন্থায় যৌন চাহিদা মিটানোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। মানুষের রক্তের ব্যাপারে এমন ফায়সালা দেওয়া হয়েছে যা নিতান্তই অন্যায় ও জুলুম

এছাড়াও আরো বেশ কিছু বিষয় আছে যেগুলো মূলত এই সব শাসকদের শরয়ী’ বিধান জানার সাথে সম্পৃক্ত।

যেমন, রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া, দারিদ্র, জুলুম ও গোনাহ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়া। মানুষ কোনো ধরণের ভয় ও আতংক ছাড়াই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম থেকে বেরিয়ে পড়ে। আর এই সমস্ত কাফের শাসকদের অনুগত রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সমাজে মন্দ চরিত্র ও গোনাহের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেয়। লোকসমাজে কুফুর ও কাফেরদের পথ ও পন্থা মোহনীয় করে তুলে। আমাদের বর্তমান অবস্থার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বাণী কতটা বাস্তবসম্মত!

তিনি এরশাদ করেন-

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

“তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম আসবে যারা সালাতকে শেষ করে দিবে। প্রবৃত্তির পিছনে ছুটবে। এরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।” [সুরা মারয়াম: ৫৯]

তিনি আরো বলেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

“জলে ও স্থলে যতসব ফাসাদ সৃষ্টি হয়, মানুষের কৃতকর্মের কারণেই হয়ে থাকে।” [সুরা রূম: ৪১]

হ্যাঁ, এসবই হল আসমান ও জমিনের রবের শরিয়ত থেকে বিমুখ হওয়ার কুফল।

উল্লেখিত কারণেই বর্তমানে মুসলমানদের উপর যেসকল বিষয় জানা আবশ্যক তার অন্যতম হল, এই সব শাসকদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম কি, তা জানা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন এবং সর্বপ্রকার নাফরমানি রক্ষা করুন।

আমাদের জানা থাকা দরকার:

আল্লাহর শরিয়তের মাঝে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা স্পষ্ট কুফর। পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম বলা কিংবা যা আল্লাহ কর্তৃক হারাম সেটাকে হালাল বলা। হালাল বলা হয় ঐ জিনিসকে যা আল্লাহ হালাল করেছেন। আর হারাম বলা হয় ঐ জিনিসকে যা আল্লাহ হারাম করেছেন। সৃষ্টির অধিকার যেমন একমাত্র তাঁর। অনুরুপভাবে হুকুম দেওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁর। আল্লাহ তা’আলা এরশাদ করেন-

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“শুনে রাখ, সৃষ্টি ও হুকুম দেওয়ার অধিকার একমাত্র তারই। বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তাআলা অনেক মহান।” [সুরা আ’রাফ: ৫৪]

সুতরাং যে মনে করে, কোন কিছুকে হালাল কিংবা হারাম করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়াও অন্যের হুকুম চলবে, সে কাফের। যেমন নাকি ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় যে মনে করবে, আল্লাহ ছাড়াও অন্য কোন খালেক-সৃষ্টিকর্তা আছে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক একাধিক রব উত্তম নাকি মহাপ্ররাক্রমশালী এক আল্লাহ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমনকিছু নামের ইবাদত কর যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা আবিস্কার করেছ। যার ব্যাপারে আল্লাহ কোন দলিল অবতীর্ণ করেন নি। হুকুম তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তার আদেশ হল, তোমরা কেবল তারই ইবাদত করবে। এটিই প্রতিষ্ঠিত ও শাশ্বত ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সুরা ইউসুফ: ৩৯-৪০]

পাঠক, একটু চিন্তা করে দেখুন, কীভাবে আল্লাহ তাআলা হুকুমের অধিকার একমাত্র নিজের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন? এটাকেই তিনি ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই হুকুমকেই তিনি শাশ্বত ও প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সাব্যস্ত করেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল, দ্বীন বলা হয় ইবাদতকে। আর ইবাদত বলা হয় আল্লাহর হুকুমের অনুগত হওয়া। একারণেই যে আসমান-জমিনের রবের হুকুম ব্যতীত অন্য কারো হুকুমের অনুগত হবে কিংবা অনুসরণ করে সে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যেরই ইবাদত করল। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মের পরিবর্তে অন্য কোন ধর্মের অনুসরণ করল। কারণ, দ্বীন তো বলাই হয় হুকুম ও আইন প্রণয়নকে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

“বাদশাহর ধর্ম অনুযায়ী তাঁর জন্য আপন ভাইকে আটক করার অধিকার নেই।” [সুরা ইউসুফ:৭৬]

আর এটা জানা কথা যে, বাদশাহর ধর্ম বলতে তারই শাসন ও হুকুমকে বুঝায়।

একারণেই তো বলা হয়, যে আল্লাহর শাসনের অনুগত হল, সেই তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হল। আর যে প্রত্যাখ্যান করল, সে তাঁর দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেল। এই সমস্ত স্পষ্ট আয়াতে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সঠিক বুঝ সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিমের এটাই হল প্রকৃত বুঝ।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

“নাকি তাদের রয়েছে এমনসব শরিক যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন এমন বিষয়াদির অনুমোদন দেয় যার ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা কোন অনুমতি দেননি।” [সুরা শূরা:২১]

এখানে আল্লাহ তাআলা আইন প্রণয়নকে দ্বীন বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সুতরাং বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রণীত বিধানই তাঁর দ্বীন।

যে তাঁর প্রণীত আইন আঁকড়ে ধরল, সে তাঁর সামনে নত হয়ে তাঁর আনুগত্য করল। আর যে তাঁর প্রণীত আইন বাদ দিয়ে অন্যের আইন আঁকড়ে ধরল সে আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করে মুশরিকদের ধর্মে ঢুকে পড়ল (এই লাঞ্চনা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই)।

যারা আল্লাহ তাআলার হুকুম বাদ দিয়ে অন্য কোন হুকুম ও আইনের কাছে বিচার প্রার্থনা করেও নিজেদের মুমিন বলে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তাদের এই দাবিকে অস্বীকার করেছেন এবং সেই হুকুম ও বিধানকে তাগুত বলে নামকরণ করেছেন।

তিনি এরশাদ করেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

"আপনি সেসব লোকদের দেখেন নি যারা এই দাবি করে যে, যা কিছু নাযিল হয়েছে আপনার কাছে এবং আপনার পূর্বেও, সবকিছুর উপর তারা ঈমান এনেছে, কিন্তু আবার তাঁরা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুত বর্জনের আদেশ করা হয়েছে। মূলত শয়তান তাদেরকে চুড়ান্ত ভ্রষ্ট বানাতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসুলের দিকে, তখন আপনি দেখবেন যে, মুনাফেকরা আপনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।" [সুরা নিসা: ৬০-৬১]

এটা তো হল ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে এই সমস্ত ভ্রান্ত ও কুফুরি আইনের কাছে বিচার প্রার্থনা করে।

তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কী হবে যে এই সমস্ত কুফুরি আইন প্রণয়ন করেছে এবং এর মাধ্যমে ফায়সালা করাকে আবশ্যক করে দিয়েছে? নিঃসন্দেহে তার ক্ষেত্রে এই আয়াতের মর্ম ও তার হুকুম আরো বেশী করে পাওয়া যায়। বরং আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী সেই তো তাগুত হয়ে যায়।

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, আল্লাহর শরিয়ত পরিবর্তনকারী এই সমস্ত শাসক কাফের এবং মুরতাদ।

আর এই পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অর্থই হল কোরআন, হাদিস ও ইজমায়ে উম্মতকে অস্বীকার করা।

আমাদের পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরাম কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদিসের মধ্যে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে সত্যানুসন্ধানীর কর্তব্য হল, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করে একদিকে রাখা। অজ্ঞতা ও মনোবৃত্তির চাদর ঝেড়ে ফেলে দেয়া। এরপর ইনসাফের দৃষ্টিতে এই মাসআলা নিয়ে গবেষণা করা। যেখানে থাকবে না কোন মনোবৃত্তি কিংবা সংশয়ের প্রশ্রয়।

তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, এই মাসআলায় হক ও সঠিক সিদ্ধান্ত সেটাই যা আমাদের সালাফ-পূর্বসূরীগণ বলে গেছেন। তাদের অন্যতম হলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ., শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ., হাফেজ ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ রহ. হাফেজ ইবনে কাছির রহ.। তাঁদের পরবর্তীদের মধ্যে হলেন, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব রহ., শায়খ আহমাদ শাকের রহ., শায়খ মাহমুদ শাকের রহ., শায়খ মুহাম্মাদ আমিন আশ-শানকিতি রহ. সহ আরো অনেকেই ইলমের আলোকে এই বিষয়ে আলোচনা করে গেছেন।

যারা এই বিষয়টিকে লোকদের থেকে আড়াল করে রাখতে চায়, হয়ত গোপন করে কিংবা এই মাসআলাটাকে ঘোলাটে বানানোর মাধ্যমে, তাদের ব্যাপারে কোরআনের ভাষ্য হল-

سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

“তাদের এই সাক্ষ্যসমূহ অবশ্যই লিখে রাখা হয় এবং তাদেরকে পরবর্তীতে জিজ্ঞাসা করা হবে।” [সুরা যুখরুফ: ১৯]

সুতরাং হে ভাই, কথাগুলো কান দিয়ে শুনে রাখ। আর যে বিষয়ে মানুষর মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে আল্লাহর কাছে সঠিক পথ লাভের জন্য প্রার্থনা কর।

এটাই ছিল রাসুলের শিক্ষা। বিশেষত, এই যুগে তো এই দো’আর প্রয়োজন আরো বেশি, যখন ইসলাম হয়ে গেছে গরিব-অপরিচিত। আমানত পরিণত হয়েছে জরিমানায়। আর হকপন্থীরা হয়ে গেছে গোরাবা-অপরিচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আহলে হক্কের অনুসারী বানান। এবং অনুসারী বানান সেই দ্বীনের যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারিদের দ্বীন হিসেবে স্বীকৃত।